এক দশকেই ভুলে যেতে বসেছি অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে

গোলাপ মুনীর

২০০৩ সালের ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টায় ঢাকার একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন একজন প্রচাররিমুখ কর্মবীর মানুষ অধ্যাপক আবদুল কাদের। বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করার পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রাণপুরুষ-প্রেরণাপুরুষ। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের সূচনাকারী-ধারকবাহক- অগ্রপথিক। একজন মহান শিক্ষক। একজন সৎ ও মহান কর্মনিষ্ঠ শিক্ষক আদর্শ পরিবার-কর্তা। তথ্যপ্রযুক্তি জগতের অলিগলিতে বিচরণকারী প্রযুক্তিপ্রেমী মানুষ। নীতি-আদর্শের তাড়নায় তাড়িত কর্মীজন। একজন সচেতন প্রকাশক, তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সাংবাদিক তৈরির অনন্য কারিগর। এমনই কত না বিশেষণেই তাকে বিশেষায়িত করে উপস্থাপিত করা যায়। তবু যেনো অপূর্ণ থেকে যায় তার পরিচয়।

২০১৩ সালের ৩ জুলাই। এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে আজ থেকে ঠিক এক দশক আগে এই অনন্য কর্মবীরকে হারিয়ে আমরা কী এক অমূল্য সম্পদ হারিয়েছিলাম। এ কর্মবীরের মৃত্যুতে তার পরিবার ও কমপিউটার জগৎ পরিবারের সাংবাদিক-কর্মচারীদের মধ্যে তো বটেই, বাংলাদেশের গোটা তথ্যপ্রযুক্তিখাতে এক গভীর শোকের ছাড়া নেমে এসেছিল। তার মৃত্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনেকেই শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. মঈন খান, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আফতাব-উল ইসলাম, বিসিএস সভাপতি মো: সবুর খান, বেসিস সভাপতি হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিমসহ অনেক জাতীয় শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তিবিদ। সেদিন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদে তার শোকবার্তায় লিখেছিলেন : 'মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের আমার ছাত্র ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিকৃৎ এবং দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে তার অবদান প্রশংসনীয়। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে গভীর আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার কার্যকর ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সবাই স্বীকার করে।'

কিন্তু তার মৃত্যুর পরবর্তী একদশকে আজকের এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মনে হয় প্রচারবিমুখ এ কর্মবীরকে আমরা হারাতে বসেছি। আমরা জাতীয়ভাবে তাকে কোনো ধরনের স্বীকৃতি দেইনি। ফলে আজকের তরুণ প্রজন্ম হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের নামের এই মানুষটিকে একেবারেই ভুলে যাবে। তার প্রতিটি মৃত্যুদিনে যে কয়টি শোকসভার আয়োজন হতে দেখেছি, সেখানে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যন্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান রাখতে শুনেছি, তাকে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে অসমান্তরাল অবদান রাখার জন্য একুশে পদক বা সে ধরনের অন্য কোনো মরণোত্তর জাতীয় পদকে ভূষিত করা হোক। কিন্তু বাস্তবে সে আবেদনের প্রতি সংশ্লিষ্টদের কোনো ইতিবাচক সাড়া আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। অনেকের ধারণা, রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত জাতির তিনি যদি কোনো একপক্ষের হতেন তবে অনেক আগেই তার ভাগ্যে অনায়াসে কোনো জাতীয় স্বীকৃতি জুটত। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই দ্বিধাবিভক্তির সমূহ উর্ধ্বে। আমরা দেখেছি, তিনি যখন ডেপুটেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, তখনও সারাদেশের শিক্ষক সমাজ ছিল দ্বিভাজিত। রাজনৈতিক দলাদলিতে লিপ্ত। এই রাজনৈতিক দলাদলিতে কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা শিক্ষক সমাজ। এ ব্যাপারটি তাকে খুবই পীড়া দিত। তাই তিনি শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে তিনি বিবদমান শিক্ষকদের নিয়ে অফিসের বাইরে তার নিজ বাসায় সমঝোতার প্রয়াস চালিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সমঝোতা প্রয়াসে কখনও সফলতা পেয়েছেন, কখনও ব্যর্থ হয়েছেন। শিক্ষা ভবনে আসা শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নানা সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন বরাবর সচেতন। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পর তার স্মরণে শিক্ষক সমাজ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একটি স্মরণসভার আয়োজন করে। সেখানে শিক্ষক সমাজের আমন্ত্রণে এক স্মরণসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বেশ কয়েকজন শিক্ষককে এসব বর্ণনা দিতে গিয়ে, কাঁদতে দেখেছি। সেখানে এমনসব ঘটনার কথা জেনেছি, তা থেকে নতুন করে উপলব্ধির সুযোগ পাই, মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

অধ্যাপক আবদুল কাদের

আজকের তরুণ প্রজন্ম জানে না কে এই অধ্যাপক আবদুল কাদের। কারণ তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে, তার নাম সময়ে সময়ে পোস্টারে-ব্যানারে-স্লোগানে উচ্চারিত হবে। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, সেখান থেকে ডেপুটেশনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তি হতে পারে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার– সে বিশ্বাস থেকে মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করে এ দেশে এক নীরব তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। পরিবারে ও সমাজে তিনি ছিলেন একজন মরমী মানুষ। এর বাইরে আর কিছুই নন।

আমি মনে করি, আজকের তরুণ প্রজন্ম মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের মতো নির্মোহ কর্মবীরকে যত বেশি করে জানবে, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় অগ্রগতির চেতনা তত বেশি করে জাগবে। তাই এখানে তার ৫৩ বছরের যাপিত জীবনের নাতিদীর্ঘ আলেখ্য উপস্থাপন করতে চাই।

মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সে হিসেবে তার জীবন পরিধি ৫৩ বছর ৬ মাস ৩ দিনের। বাবা মরহুম আবদুস সালাম ছিলেন ঢাকার লালবাগের নওয়াবগঞ্জের ৬ নম্বর হোসেন উদ্দিন প্রথম লেনের স্থায়ী অধিবাসী। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। অধ্যাপক আবদুল কাদের ১৯৭৬ সালের ২০ মে নাজমা কাদেরকে বিয়ে করেন। বর্তমানে মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার গুরুদায়িত্বটি তিনিই পালন করছেন অধ্যাপক ▸

আবদুল কাদেরের নীতি-আদর্শকে লালন করেই।

অধ্যাপক আবদুল কাদেরের শিক্ষাজীবন শুরু ঢাকার নওয়াবগঞ্জের নবাববাগিচা প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৬৪ সালে ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। এইচএসসি পাস করেন ১৯৬৬ সালে, ঢাকা কলেজ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ও মৃত্তিকাবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি নেন যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে। তিনি কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : ঢাকার বিএমডিসি থেকে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাংকের কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ঢাকা সাভারের বিপিএটিসি থেকে উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স। এছাড়া নিয়েছেন কমপিউটারবিষয়ক ২০টি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ। শিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও।

তার কর্মজীবন শুরু ১৯৭২ সালের অক্টোবর, ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের প্রভাষক হিসেবে। এই কলেজসহ আরও একটি কলেজে শিক্ষকতা করেন ১৯৯৫ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। উন্নীত হন সহযোগী অধ্যাপক পদে। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তার সেখানে শুরুটা ছিল নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও এ অধিদফতরের কমপিউটার সেলের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে। ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই থেকে দায়িত্ব পান এই অধিদফতরের নির্বাচিত সরকারি কলেজে কমপিউটার কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে। অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন ছুটিতে কাটান। ছুটি শেষে এই অধিদফতরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর দিনও তিনি যথারীতি সে দায়িত্বরত ছিলেন।

আবারও বলছি, তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন আমাদের মতো একটি দেশে কাঙ্ক্ষিত সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো। সে বিশ্বাস নিয়ে তার অবস্থান থেকে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে রেখে গেছেন অসমান্তরাল অবদান। মাসিক কমপিউটার জগৎ-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেই আন্দোলন। তিনি এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তিপ্রেমী মানুষের কাছে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক। এই মানুষটিকে যাতে আগামী প্রজন্ম তাদের চেতনার উৎস করে তুলতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন তার একটি জাতীয় স্বীকৃতি। জাতীয় কোনো পদক উপহার দেয়া। আর তখন এর মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি কজ

অকালে মহাকালের এক যাত্রী

আবীর হাসান

তিনি শুধু দিয়েই গেছেন– নেননি কিছুই। ক্ষুদ্র জীবনকালে নিজের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কখনই মেলাতে চাননি। চেয়েছেন দেশ কিছু পাক, উন্নত হোক। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বলীয়ান করতে লাগসই প্রযুক্তি তাদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। আদর্শবান শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল কাদের বহুমাত্রিক কর্মপরিধির মধ্যে নিজের সত্তাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন সময় হাতে খুব কম– তাই অনেক কিছু করতে চেয়েছিলেন দ্রুত। আসলে এটাই তার মুখ্য চাওয়া ছিল– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশকে দ্রুত উন্নত করে তোলা। এরই একটি ক্ষুদ্র অংশ তার প্রতিষ্ঠিত মাসিক কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটি। ক্ষুদ্র অংশ বলছি এ কারণে যে, তার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা ছিল বিশাল-বিপুল। আর দূরদর্শিতা ছিল অপরিমেয়।

অধ্যাপক আবদুল কাদের বুঝেছিলেন ব্যয়বাহুল্য আর বুঝতে না পারার ভয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে দূরে সরে থাকলে বৈশ্বিক অর্থনীতি-সংস্কৃতি এবং রাজনীতি থেকেও পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ। এদেশের ভবিষ্যৎ সক্ষমতা যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপরই নির্ভর করছে, তা তার উপলব্ধিতে এসেছিল অনেক দিন আগেই। যোগাযোগের বিষয়টি যে অতীব জরুরি, তা তার বোধের মধ্যে ছিল ছাত্রজীবন থেকেই। বিকল্প রেডিও যোগাযোগ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাতেন সে সময়ই। ছাত্র জীবনেই ষাটের দশকের শেষ দিকে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম ছিল 'টরেটক্কা'।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রই ছিলেন, তবে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের। কিন্তু নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির দিকে ছিল আলাদা ধরনের টান। ফোর প্লাস কমপিউটার দেশে আসার পর থেকেই তিনি নিজে অনুশীলন শুরু করেন সেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। কমপিউটিংয়ের শক্তি দিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রায় কী কী করা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ছিল তার সে সময় থেকেই। তখনই তিনি বলেছিলেন, পুরো রাজধানী ঢাকার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায় মাত্র ৮টি ফোর প্লাস কমপিউটার দিয়ে। এছাড়া কোন কোন বিষয়কে প্রোগ্রামের আওতায় আনা যায় সেসব নিয়েও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন তিনি। সে সময় যেসব অফিসে কমপিউটার ব্যবহার হতো, সেসব অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। অনেকের সাথে পরে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কেও গড়ে উঠেছিল।

সে সময় তিনি লক্ষ করেন কমপিউটার প্রশিক্ষণদানের তেমন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই দেশে। উচ্চ শিক্ষিতেরা বিদেশে যেতেন কিংবা কোনো কোনো কোম্পানি বিদেশ থেকে উচ্চ বেতনের কর্মকর্তা নিয়ে আসত। সে সময় অপারেটর বলতে গেলে কেউ ছিলেন না, প্রোগ্রামার ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন। এরকম অবস্থায় নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে আজিমপুরে 'কমপিউটার লাইন' নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

ওই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করেই শুরু করলেন কমপিউটার সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ। বেশ কয়েকটি সভা হয়েছিল পরবর্তী এক বছরের মধ্যে। মত বিনিময়ের একটা বিশেষ গুণ ছিল অধ্যাপক আবদুল কাদেরের। কমপিউটার প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহার ব্যাপক করার জন্য করণীয় ঠিক করতে গিয়ে একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন মাসিক পত্রিকা প্রকাশের। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন মাসে মাসে এত লেখা পাওয়া যাবে কোথায়? ভয়টা ছিল এ কারণে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা নয়– শুধু কমপিউটার নিয়ে এত লেখা লিখবেন কারা? বিষয়বস্তু কোথায়? তখন দেশে-বিদেশে এরকম সোর্সও ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কমপিউটারবিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো গোটা দুয়েক। আর ব্রিটেনে মাত্র একটি। সেগুলো বুঝে পাঠোদ্ধার করার মতো লোকও তখন ঢাকা শহরে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। অনুবাদ তো ছিল আরও দুরূহ ব্যাপার। সে সময় নিজউ উইক, টাইমস, ইকোনমিস্ট– এসব পত্রিকাতেও আইসিটি নিয়ে তেমন কিছু লেখা হতো না, মাঝেমধ্যে কিছু বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত। আমার নিজের কথা বলি– ওই বিজ্ঞাপনগুলোই ছিল আমার কাছে সোর্স। অধ্যাপক আবদুল কাদের বিদেশে অবস্থানকারী পরিচিতজনদের মাধ্যমে সেখানকার আইসিটি ম্যাগাজিন ও ক্যাটালগ সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে কমপিউটার জগৎ-এর কনটেন্টকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন আগ্রহী তরুণ এবং বলতে গেলে একেবারেই নতুন লেখকদের।

সে সময় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে যারা লিখতেন, তাদের সবার কাছেই অধ্যাপক আবদুল কাদের নিজে গিয়েছেন। তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন লেখার জন্য। এছাড়া আর একটি পন্থা তিনি বের করেছিলেন– প্রোগ্রামার ও টেকনোলজি এক্সপার্ট যারা ছিলেন, তাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার নিয়মিত একটি ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এছাড়া টেকনোলজি নিয়ে রিপোর্টিংও বাংলাদেশে প্রথম শুরু করে কমপিউটার জগৎ। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কমপিউটারবিষয়ক ম্যাগাজিনগুলো ছিল খুবই উঁচু ধারণার টেকনিক্যাল বিষয়ে ভরপুর। অধ্যাপক আবদুল কাদের কিন্তু কমপিউটার জগৎ-কে একেবারে ওগুলোর মডেলে গড়ে তোলেননি। তার যুক্তি ছিল টেকনিক্যাল বিষয় অবশ্যই থাকবে, কিন্তু বেশি থাকতে হবে প্রযুক্তিকে পরিচিত করার সহজ উপায় নিয়ে লেখা এবং প্রযুক্তিবিদদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবে সবচেয়ে বেশি তিনি প্রাধান্য দিতেন চলমান ইস্যুগুলোকে।

নিজে শিক্ষাবিদ হিসেবে শিক্ষার উন্নয়নে আইসিটির ব্যবহারকে অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। এক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। সে সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটারায়নের জন্য যে কাজগুলো তিনি করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। আমলাতন্ত্রকে প্রচলিত ধারণার বাইরে এনে বুঝিয়ে কাজ করানো, সরকারি নীতি-পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়াটা আসলে একক প্রচেষ্টাতেই করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। এখন এক বাক্যে এ কথাটা লেখা গেলেও তাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শত শত নোট লেখা, মিটিং করতে করতে তিনি মাঝেমধ্যে ক্লান্তও হয়ে পড়তেন। কিন্তু কী এক প্রেরণায় নতুন উদ্যম নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেন কাজে।

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে বিষণ্নতায় ভোগেননি কখনও। সে সময় কমপিউটার নিয়ে ভীতি ছিল মন্ত্রণালয়গুলোর সর্বত্র। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব বিভাগে কমপিউটারায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছিল। এটা কর্মকর্তা পর্যায় থেকেই দেয়া হয়েছিল। এসব অনেক বিষয় অধ্যাপক আবদুল কাদেরের জানা ছিল। তিনি জানতেন অমূলক ভীতি থেকেই এসব করা হচ্ছে। সে কারণে তাকে নিতে হয়েছিল ভিন্ন কৌশল। কমপিউটারায়নের ফলে কর্মহীনতার সৃষ্টি হবে না– এ কথাটা তিনি অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন সংশ্লিষ্টদের। কিন্তু গলদ ছিল অন্য জায়গায়, সেটা বুঝতে সময় লেগেছিল। ইন্টারনেটের ইস্যুটা যখন এলো তখন তৎকালীন মন্ত্রীই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।

অধ্যাপক আবদুল কাদের কয়েকজন গণ্যমান্য শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তিবিদ ও সাংবাদিককে নিয়ে সংসদ ভবনে তথ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, যাতে ফাইবার অপটিক ক্যাবল

(বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়)

অকালে মহাকালের এক যাত্রী

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

সংযোগ দ্রুত পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রী বললেন রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা। ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল ওই প্রতিনিধি দলটিকে। অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কেউ কেউ হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল কাদের বলেছিলেন, সমাজের পশ্চাৎপদতার বাইরে তো মন্ত্রীরা কিংবা অন্য দায়িত্বশীলেরা নন। কাজেই এ ধরনের অসচেতনতার মুখোমুখি আরও হতে হবে। সত্যিই তাই হয়েছিল। ক'দিন পরই তৎকালীন কমপিউটার কাউন্সিলের শীর্ষ পদাধিকারী এক সেমিনারে কমপিউটারকে বলে বসলেন 'শয়তানের বাক্স'।

ওই প্রতিকূল পরিবেশে নব্বইর দশকের গোড়ার দিকে কোনো গণমাধ্যম ছিল না এসবকে জনসম্মুখে আনার মতো। দৈনিক পত্রিকাগুলো তো কমপিউটার বিষয়ক কোনো কিছুকে সংবাদ হওয়ার মতো উপযোগী বলে মনে করত না। সেই সব দিনে প্রতিবাদমুখর প্রযুক্তিবিদদের জন্য একমাত্র প্লাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কমপিউটার জগৎ। আর এর প্রাণপুরুষ অধ্যাপক আবদুল কাদের পাশাপাশি চালিয়ে গিয়েছিলেন নতুন পেশাজীবী তৈরির কাজ। নতুন প্রজন্মের অনেককে যেমন তিনি তৈরি করেছিলেন, তেমনি প্রযুক্তিসচেতন অনেক প্রবীণকেও সুসংহত চেতনায় উজ্জীবিত করেছিলেন।

সরকার পরিবর্তন হলো, প্রযুক্তিরও উন্নতি হলো আর এদেশেও কমপিউটারের চাহিদা বাড়তে শুরু করল। তখন শুল্কমুক্ত কমপিউটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল প্রচণ্ডভাবে। তখন সব দৈনিক পত্রিকা ডেস্কটপ পাবলিশিংয়ে চলে গেলেও এসব বিষয়ে নীরব ভূমিকাতেই ছিল। এই কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত নিবন্ধ-সাক্ষাৎকার নিয়ে বলতে গেলে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন অধ্যাপক আবুদল কাদের। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অর্থমন্ত্রীকে রাজি করানো হলো, কিন্তু বেঁকে বসলেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী। অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় রইল না। সেখানেও কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তাবনা আনুষ্ঠানিক সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সাফল্য এলো। অধ্যাপক আবদুল কাদের ধন্যবাদে সিক্ত হলেন, কিন্তু তার মনে তখন অন্য চিন্তা– ডাটা এন্ট্রির জন্য লোকবল তৈরি করা, শিল্প-বাণিজ্যিক মেরুদণ্ড হিসেবে আইসিটিকে প্রতিষ্ঠা করা।

চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই প্রচার আর সাথে যুক্ত হয়েছিল মেধা অনুসন্ধানের কার্যক্রম। কমপিউটার জগৎকে কাজে লাগিয়ে তিনি চাইলেন দেশব্যাপী আলোড়ন তুলতে। স্কুলে-স্কুলে কমপিউটার পৌঁছাতে আর রাজধানী ও বড় শহরগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পর্যায়ের জন্য ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে। তাগিদ দিয়েই-প্রচার চালিয়েই ক্ষান্ত হননি। যতটুকু তার ক্ষমতা ছিল সেটুকুর শেষবিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছেন। এক সময় কমপিউটার জগৎ হয়ে ওঠে নতুন প্রজন্মের এবং নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাণের পত্রিকা। কমপিউটার জগৎ-এর কাছে তাদের চাহিদা ছিল অপরিমেয় আর সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বাণিজ্যিক লোকসানের দিকে তাকাননি অধ্যাপক আবদুল কাদের। কলেবর বাড়িয়েছেন ও পাবলিশিং কোয়ালিটি উন্নত করেছেন।

নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে কমপিউটার জগৎ এ দেশের আইসিটিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। পথ দেখিয়েছে অনেক কিছুর। কতগুলো পত্রিকা যে প্রকাশিত হয়েছিল কমপিউটার জগৎ-এর আঙ্গিকে আর সেগুলোর প্রকাশকদের অনেকেরই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জায়গা ছিল কমপিউটার জগৎই। শিক্ষক আবদুল কাদের কাউকেই প্রতিযোগী ভাবেননি। কারোর জন্য স্নেহের কমতি ছিল না তার।

এ দেশে অনেক প্রথমের উদ্যোগী তিনি। পত্রিকাটির কথা বাদই দিলাম। ঢাকার বাইরে প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনী, প্রথম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, প্রথম ক্যুইজ কম্পিটিশন, প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ, ফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য প্রথম সংবাদ সম্মেলন, মোবাইল ফোনের দাম কমানোর জন্য প্রথম সেমিনার– এসব তারই অবদান।

নতুন শতাব্দীর আলো দেখলেন, কিন্তু সুস্থতা তাকে ছেড়ে গেল। মানসিক চাপ এবং অতিরিক্ত কাজের জন্যই কি এমনটি হয়েছিল? অসুস্থ অবস্থায় যখন ঘোরাঘুরি সীমিত হয়ে পড়েছিল তখনও তিনি কমপিউটার জগৎ-কে নির্দেশনা দিয়েছেন। কাছের বলে যাদের মনে করতেন, সবিনয়ে তাদেরকে একটু দেখা করতে বলতেন। নিজের কথা বলতেন খুব কমই কিন্তু আইসিটির কথা, চলমান ঘটনাবলী আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয় শেষদিকেও ছিল।

২০০৩ সালের ৩ জুলাই নিভল প্রদীপ। কিন্তু কমপিউটার জগৎকেই হয়তো তিনি দিয়ে গেছেন তার জীবনীশক্তির সবটুকু। সেটা বেঁচেবর্তে আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশও গড়ে উঠছে। তিনি থাকলে হয়তো এই নতুন পথচলার খুঁতগুলো আরও ভালো করে চোখে পড়ত। আফসোসটা এই যে, অকাল-মৃত্যু তারই কেনো হলো? আর আমরা তার প্রাপ্য সম্মানটা কি তাকে দিয়েছি? জীবদ্দশাতেই তো উচিত ছিল অনেক সম্মাননা পাওয়া, সেটা যখন হয়নি– অকালে মহাকালের ডাকে যখন তিনি পাড়ি জমিয়েছেন, তখন মরণোত্তর কি কিছুই করার নেই আমাদের? তিনি যে অনেক দিয়েছেন আমাদের...। কজ

মনে পড়ে অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির আন্দোলনের পথিকৃৎ অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের দশম মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৩ সালের ৩ জুলাই। দেখতে দেখতে দশটি বছর কেটে গেল। তিনি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশ চলে গেছেন।

তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেও এদেশে তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে প্রযুক্তিপ্রেমীদের কাছে অমর হয়ে আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন তার অনবদ্য অবদানের জন্য। তিনি যে সময় কমপিউটার জগৎ নামে কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকা বের করার উদ্যোগ নেন তখন তা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। কেননা, নব্বই দশকে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের মাঝে কমপিউটার ভীতি ছিল প্রচণ্ড। তখন ধারণা করা হতো, এদেশে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়লে দেশের বেকারত্ব বেড়ে যাবে ব্যাপকভাবে। তাই সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি সব মহলই কমপিউটারের ব্যবহার বা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ছিল সোচ্চার। সে কারণে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কোনো কোনো কর্মকর্তা কমপিউটারকে 'শয়তানের বাক্স' বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে অধ্যাপক আবদুল কাদের কমপিউটার জগৎ নামে এক কমপিউটারবিষয়ক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৯১ সালের মে মাসে।

অধ্যাপক আবদুল কাদের স্কুলজীবন থেকেই ছিলেন প্রচণ্ডভাবে প্রযুক্তিপ্রেমী। স্কুলজীবনেই তিনি 'টরেটেক্কা' নামে একটি মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশ করেন। তিনি মূলত মৃত্তিকা বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও কমপিউটারের প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। তাই দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে কমপিউটারসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে পড়তেন এবং নিজেই কমপিউটারের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে 'কমপিউটার লাইন' নামে একটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন ১৯৮৯ সালে। এ সময় সারাদেশের মধ্যে শুধু ঢাকাতেই হাতেগোনা কয়েকটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল, যা সাধারণ জনগণের জন্য ছিল খুবই ব্যয়বহুল। সে সময় ডসভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যেমন ওয়ার্ড স্টার, লোটাস, ডি-বেজের মতো সাধারণ কোর্সে ১-২ মাসের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নেয়া হতো প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা করে।

কমপিউটার প্রশিক্ষণের চার্জ কমানোর ভূমিকা

কমপিউটার যে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হতে পারে, তা আবদুল কাদের যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সে সময় ব্যয়বহুল কমপিউটার প্রশিক্ষণকে সবার নাগালে আনার লক্ষ্যে এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে কমপিউটারে প্রশিক্ষিত করতে কমপিউটার লাইন নামে একটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সে সময় যে কোর্সগুলোর জন্য ২৫০০-৩০০০ টাকা নেয়া হতো। তিনি ওই কোর্সগুলো মাত্র ৭০০-৯০০ টাকার মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা অন্যান্য কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি এবং এর বিরোধিতাও করে। তাদের যুক্তি ছিল কমপিউটারের উচ্চমূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, ট্যাক্সসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অনেক। তাই এত কম চার্জে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালানো যাবে না। তিনি তাতেও পিছপা হননি এবং বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে তিনি সফলও হন। কিন্তু ছোট একটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিয়ে এ দেশের জনগণকে কমপিউটারের সুফল সম্পর্কে সচেতন করা যাবে না, তা উপলব্ধি করেই আরেক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেন কমপিউটার বিষয়ে বাংলা পত্রিকা বের করার।

কমপিউটার বিষয়ক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে এদেশের প্রথিতযশা আইসিটি ব্যক্তিত্বদের সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেন, কিন্তু কেউ তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি। কারণ, নব্বই দশকে এদেশে জনগণের মাঝে কমপিউটার ভীতি ছিল প্রচণ্ড। শুধু আইসিটি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই আইসিটির ব্যাপক প্রসার ঘটুক তা মেনে নিতে পারছিল না দেশে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু এতে তিনি দমে না গিয়ে এই প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিকে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন এবং ১৯৯১ সালের মে মাসে কমপিউটার জগৎ নামে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।

প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মরহুম আবদুল কাদের তার পত্রিকা কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম প্রকাশনা শুরু করেন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগান নিয়ে। যার আধুনিক সংস্করণ হলো– বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বলা যায়। কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা যখন শুরু হয়, তখন বাংলাদেশে বিরাজ করছিল কমপিউটার ভীতিসহ নানা প্রতিকূলতা। এর মধ্যে অন্যতম হলো সরকার আরোপিত উঁচু হারের ট্যাক্স। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী মহল বিশ্বাস করত কমপিউটার হলো আভিজাত্যের প্রতীক এক বিলাসবহুল পণ্য। কমপিউটার জগৎ সেই ভুল বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে কমপিউটারকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে লড়াই করে গেছে তার লেখনী ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

কমপিউটার পণ্যের ওপর আরোপিত ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবি

১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে কমপিউটার জগৎ এদেশে সর্বপ্রথম কমপিউটারের দাম কমানোর জোরালো দাবি তোলে অধ্যাপক আবদুল কাদের। তিনি যুক্তি দেখান, কমপিউটারের দাম কমলে কমপিউটার কেনার ক্ষমতা মধ্যবিত্তের আয়ত্তে আসবে। এতে দেশে কমপিউটারের প্রসার যেমন ঘটবে, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ আইটি জনবল তৈরিতে ভূমিকা রাখবে, যা পরবর্তী সময়ে দেশের রুগ্ন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে ভূমিকা রাখবে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কমপিউটার জগৎ তথা অধ্যাপক আবদুল কাদের কমপিউটার ও কমপিউটারসংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর ওপর ভ্যাট ও ট্যাক্স কমানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে দেন-দরবার করার পাশাপাশি তার পত্রিকার মাধ্যমে জোরালো দাবি জানিয়ে ব্যাপক জনমত গড়তে সক্ষম হন, যা পরবর্তী পর্যায়ে কমপিউটার ও কমপিউটারসংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককর কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

নব্বইয়ের দশকে আইসিটি সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কেননা, সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পের প্রধান সংগঠন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএস ১৯৮৭ সালে ১১টি সদস্য কোম্পানি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিএস ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯২ সালে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের অনুমোদনসহ নিবন্ধন লাভ করে। এ সময় বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো আইসিটি সংশ্লিষ্ট খবরাখবর ও প্রচার-প্রচারণায় ছিল সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, ১৯৯২ সালে নিবন্ধ লাভ করা ছোট একটি স্বল্প পরিচিত সংগঠন বিসিএসের আইসিটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট যৌক্তিক দাবিগুলো সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল তেমনভাবে গুরুত্ব দিত না। বিসিএস ছাড়া বাংলাদেশে আইসিটিসংশ্লিষ্ট অপর দুটি সংগঠন বেসিস এবং আইএসপিএবির তখনও জন্ম হয়নি। এমন অবস্থায় একমাত্র কমপিউটার জগৎ আইসিটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব যৌক্তিক দাবিগুলো যেমন ভ্যাট-ট্যাক্স কমানোর দাবি দেশের সর্বসাধারণ সামনে তুলে ধরে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে যেমন সক্ষম হয় তেমনই সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলকেও এ ব্যাপারে সচেতন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশে কমপিউটার এবং কমপিউটারসংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর আরোপিত ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রত্যাহারে মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের ভূমিকা ছিল অসীম। আর তাই সাবেক বিসিএস সভাপতি এবং অ্যামচ্যামের সাবেক প্রেসিডেন্ট আফতাব-উল

(বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়)

মনে পড়ে আবদুল কাদেরকে

(৪৬ পৃষ্ঠার পর) ইসলাম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলীতে তার লেখায় উল্লেখ করেন, 'আইসিটি খাতকে থ্রাস্ট সেক্টর ঘোষণা এবং কমপিউটার সামগ্রীর ওপর থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স পুরোপুরি প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের বিভিন্ন মহলে তিনি নিজের উদ্যোগে যোগাযোগ করতেন। এক্ষেত্রে কাদের ভাইয়ের অবদান আইসিটি শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের চেয়েও অনেকগুণ বেশি। এ আমার দৃঢ়বিশ্বাসও বটে কজ

গুগল সার্চের সহজ কৌশল

গুগল সার্চের সহজ কৌশলের শেষ পর্বে আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে গুগল সার্চ কাজ করে। এতদিন গুগল সার্চের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, অথচ কিভাবে গুগল সার্চ কাজ তাই যদি জানা না থাকে তাহলে কেমন হয়?

হাসান মাহমুদ

গুগল সার্চ যেভাবে কাজ করে

গুগল কিভাবে কাজ করে সেটা এখনও সবার মধ্যে বিস্ময়কর। এতগুলো ওয়েবসাইটের মধ্য থেকে গুগল কিভাবে তালিকাবদ্ধ করে এদেরকে সামনে নিয়ে আসে। গুগলের জন্ম দুটি ব্যক্তির হাত ধরে, যাদের একজন হচ্ছেন ল্যারি পেইজ এবং আরেকজন সের্গেই ব্রিন।

গুগলের মূলমন্ত্র হলো 'বিশ্বের তথ্য সন্নিবেশিত করে তাকে সবার জন্য সহজলভ্য করে দেয়া', যেখানে গুগলের অপ্রাতিষ্ঠানিক মূলমন্ত্র হলো 'Don't be evil'। গুগল সারা বিশ্বে বিভিন্ন ডাটা সেন্টারে প্রায় এক মিলিয়ন সার্ভার চালায় ও প্রতিদিন এক বিলিয়নের ওপর সার্চের অনুরোধ এবং প্রায় ২৪ পেটাবাইট ব্যবহারকারীর মাধ্যমে তৈরি করা ডাটা প্রক্রিয়াজাত করে। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর অনুযায়ী এলেক্সা আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা ওয়েবসাইটের তালিকায় স্থান দেয় গুগলকে।

আমরা বর্তমানে গুগলের যে হোম পেজটি দেখতে পাই সেটি আপডেট করা হয়েছিল ২০১১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। আমরা সবাই অন্তত দিনে কয়েকবার গুগলে সার্চ দিয়ে থাকি এবং নিজেদের পছন্দমতো ফলাফল পাই। এবার জেনে নেই গুগলের সার্চ কীভাবে কাজ করে।

০১. গুগলবট নামে গুগলের এক ধরনের ওয়েব ক্রলার আছে, যার কাজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে বিশ্বের সব ধরনের ওয়েবপেজ ভিজিট করা। যদি আপনার সাইটের সার্চিং বন্ধ করে রাখেন, তাহলে গুগল সার্চ ইঞ্জিন আপনার সাইট সার্চ করতে পারবে না।

০২. এ বটগুলো সবসময় আপনার পছন্দের ফলাফল দিতে ব্যস্ত থাকে। তাই তারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটের পেজগুলো ক্রলিং করে, এমনকি একই পেজ আবার ক্রলিং করে, যাতে কোনো তথ্য বাদ না যায়।

০৩. গুগলবট সবচেয়ে বেশি সে সাইটটি ক্রল করে, যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। যেমন একটি কোম্পানির সাধারণ ওয়েবসাইট থেকে একটি নিউজ সাইট সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ক্রলিং হয় (কারণ নিউজ সাইটগুলো প্রতিনিয়ত আপডেট হয়ে থাকে)।

০৪. গুগলবট একটি সাইটের প্রত্যেকটি লিঙ্ক শনাক্ত করে রাখে। এ লিঙ্কগুলোকে গুগলবট তাদের একটি লাইনে বিন্যস্ত করে রাখে এবং পরে কোনো এক সময় এ লিঙ্কগুলো ভিজিট করে। তাই ওয়েবসাইটে বেশি লিঙ্ক ব্যবহার করলে তা পেজের র‍্যাঙ্ক বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

০৫. গুগলবট তাদের ভিজিট করা প্রত্যেকটি পেজকে একটি সূচিপত্রে সাজিয়ে রাখে। এ সূচিপত্রটি আমাদের বইয়ের সূচিপত্রের মতো। যেমন অধ্যায় এক : বাংলাদেশের ইতিহাস–পেজ নম্বর : ১, ঠিক এমনভাবেই গুগলবট প্রত্যেকটি পেজকে একেকটি ক্যাটাগরির সূচিপত্রে সাজিয়ে রাখে।

০৬. যখনই আপনি কোনো কিছু অনুসন্ধান করেন, সেই অনুসন্ধান অনুযায়ী সূচিপত্র থেকে তথ্য নিয়ে সার্চের ফলাফলে প্রকাশ করে। যেমন আপনি কোনো দোকানে গিয়ে বললেন, ভাই আমার টুথপেস্ট লাগবে। দোকানদার ঠিক তখনই টুথপেস্টের জন্য সাজানো তাক থেকে অনেকগুলো টুথপেস্ট নিয়ে আপনার সামনে রাখে; এবার পছন্দ করার দায়িত্ব আপনার।

ঠিক তেমনি হয়তো গুগলে সার্চ দিলেন 'বাংলাদেশী টেক' শব্দটি দিয়ে। এবার গুগল তার সূচিপত্রে রাখা 'বাংলাদেশী টেক' ক্যাটাগরি থেকে আপনাকে সব তথ্য খুঁজে দেবে। এবার আপনি পছন্দ মতো সাইটে ভিজিট করতে পারবেন।

০৭. ঠিক একই সময় গুগল সার্চ ইঞ্জিন প্রত্যেকটি সাইটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রাখে, যা সার্চিংয়ের সময় দেখানো হয়। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, কোনো কিছু সার্চ দিলে অনেকগুলো সাইটের নামের নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকে।

০৮. গুগল তার একই ক্যাটাগরির সূচিপত্রে একই ধরনের ওয়েবসাইটকে রাখার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় লক্ষ করে। গুগলের এ ওয়েবসাইট র‍্যাঙ্কিং কিসের ভিত্তিতে হয়, তা সবার কাছে অজানা। তবে বলা হয়ে থাকে ২০০টি ফ্যাক্টরের দিকে গুরুত্ব দিয়ে গুগল এ র‍্যাঙ্কিং করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গুগল পেজ র‍্যাঙ্ক। কতগুলো ওয়েবসাইট একটি পেজের মধ্যে লিঙ্ক করা আছে এবং সেই লিঙ্ক করা সাইটগুলোর গুণ কতটা ভালো, তার ওপর ভিত্তি করে পেজ র‍্যাঙ্ক করা হয়।

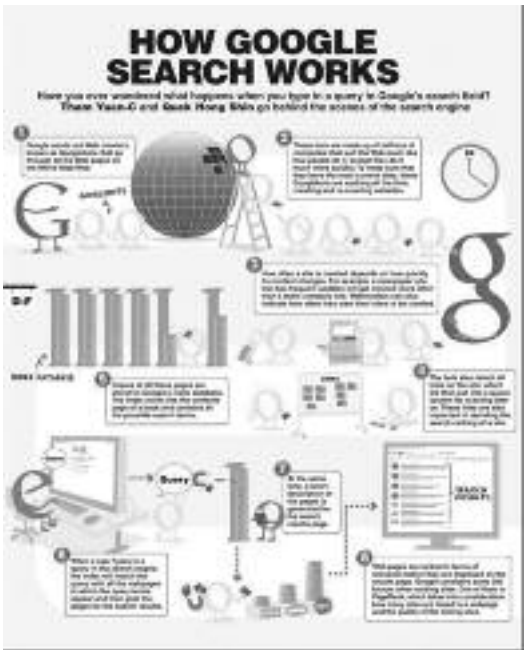

উপরের চিত্রটি দেখলে গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের পদ্ধতি খুব সহজেই বোঝা যায়

বর্তমানে গুগল কয়েক লাখ সার্ভার ব্যবহার করে। গুগলের কৌশল হচ্ছে কাস্টমাইজ করা অপারেটিং সিস্টেমযুক্ত কম দামী সিস্টেম ব্যবহার করা। অপারেটিং সিস্টেমটি লিনআক্স। সার্ভারগুলো ডকুমেন্ট সার্ভার, অ্যাড সার্ভার ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সার্ভারগুলোতে ডাটা ৬৪ মেগাবাইট ব্লকে স্টোর করা থাকে। ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ডাটা তিনটি করে কপি করা হয় এবং স্টোর করা হয় আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই সংবলিত মেশিনে। একটি পাওয়ার সাপ্লাই লাইনে পরিচালিত কোনো সার্ভারে একই ডাটার দুটি কপি থাকে না এবং ডাটাগুলো এমনভাবে বণ্টন করা হয়, যাতে যেকোনো দুটি সার্ভারে কখনই একই ধরনের ডাটা থাকে না। মানে বিষয়টি এরকম–কোনো সার্ভারে যদি জি-মেইল, ইনডেক্স ও আর্থের ডাটা থাকে। অন্যকোনো সার্ভারে ঠিক এই তিন ধরনের ডাটা থাকবে না। হয় জি-মেইল, ইনডেক্স, ইমেজ অথবা ইনডেক্স, আর্থ, গুগল ডক এরকম। দ্বিতীয় কোনো সার্ভার পাবেন না যেটাতে জি-মেইল, ইনডেক্স ও আর্থের ডাটা আছে।

গুগল প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত। ০১. গুগলবট, ০২. ইনডেক্সার ও ০৩. কোয়েরি প্রসেসর।

গুগলবট : গুগলবট ওয়েব থেকে পেজ ▸

সংগ্রহ করে। এর কার্যপদ্ধতি অনেকটা আমাদের ব্যবহার করা ওয়েব ব্রাউজারের মতোই। গুগলবটও ওয়েব সার্ভারে ব্রাউজারের মতো পেজ রিকোয়েস্ট পাঠায়। সার্ভার থেকে পেজগুলো পাঠানো হলে সেগুলো স্টোর করে। আমাদের ব্রাউজারের মতো হলেও গুগলবট অনেক বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন। অসংখ্য কমপিউটারের সমন্বয়ে গুগলবট একসাথে কয়েক হাজার পেজ রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে। অনেক দুর্বল সার্ভার গুগলবটের এ বিপুল সংখ্যক রিকোয়েস্ট রেসপন্ড করার সাথে সাথে সাধারণ ইউজারদের রিকোয়েস্ট রেসপন্ড করতে পারে না। তাই সাধারণ ব্যবহারকারীদের প্রাধান্য দিয়ে গুগলবটকে পূর্ণ ক্ষমতায় চালানো হয় না।

গুগলবট নতুন ইউআরএল সংগ্রহ করে প্রধানত দুটি উপায়ে। ০১. http://www.google.com/ addurl.html-এ পাতায় সাবমিট করা পেজ। ০২. ওয়েব ক্রলিংয়ের মাধ্যমে।

গুগলবট যখন একটি পেজ সংগ্রহ করে, তখন এ পেজে পাওয়া লিঙ্কগুলো তার ক্রলিং তালিকায় যোগ হয়। এ পদ্ধতিতে একই লিঙ্ক অসংখ্যবার আসে, কিন্তু গুগলবট সেগুলোকে বাদ দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করে যাতে সবচেয়ে কম সময়ে পুরো ওয়েবকে কভার করা সম্ভব। এ ব্যবস্থাকে বলে ডিপ ক্রলিং। কোন পেজ কত দ্রুত পরিবর্তন হয় সেটি ঠিক করা গুগলবটের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। গুগল ডাটাবেজকে আপডেট রাখার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি জরুরি। গুগলবট কোনো পেজে পরিবর্তনের একটি ফ্রিকোয়েন্সি বের করে এবং সেই হিসেবে ঠিক করা হয় যে গুগলবট কত সময় পরপর কোনো পেজ ক্রলিং করবে। কারণ যে পেজ মাসে একবার পরিবর্তন হয় সেটা কয়েক ঘণ্টা পরপর ক্রলিং করা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সবসময় পরিবর্তনশীল সাইটগুলো কয়েক ঘণ্টা পরপর ক্রলিং করা হয়। দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন আর বাংলাদেশের বেশিরভাগ সরকারি সাইটের মতো পেজগুলো মাসে একবার। ডাটাবেজ আপডেট করার এ ক্রলিংকে ফ্রেশ ক্রলিং বলে।

গুগল ইনডেক্সার : গুগল ইনডেক্সারের কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ। গুগলবট ইনডেক্সারকে ক্রলিং করা পেজগুলোর ফুল টেক্সট দেয়। ইনডেক্সার সার্চ টার্মগুলোকে বর্ণমালা অনুক্রমে সাজায় এবং কোন টার্ম কোথায় আছে তা সেভ করে রাখে। কিছু পরিবর্তনও আনা হয় পেজগুলোতে। কিছু বিরাম চিহ্ন বাদ দেয়া হয়। একের অধিক স্পেস থাকলে সেটাও বাদ দেয়া হয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষরগুলোকে ছোট হাতের অক্ষরে পরিবর্তন করা হয়।

গুগল কোয়েরি প্রসেসর : এটি সর্বশেষ অংশ। এটাই আমাদের সার্চ রেজাল্ট প্রসেসিং করে। কোয়েরি প্রসেসর কয়েকটি অংশে বিভক্ত– ইউজার ইন্টারফেস, কোয়েরি ইঞ্জিন, রেজাল্ট ফরম্যাট ইত্যাদি। গুগলের ওয়েবপেজ র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমের নাম পেজর‍্যাঙ্ক। যে পেজের পেজর‍্যাঙ্ক যতবেশি সেটা সার্চ রেজাল্টে তত উপরে থাকে। পেজর‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা হয় অনেক কিছু বিচার করে। পেজটির জনপ্রিয়তা, সার্চ টার্মের অবস্থান ও আকার, অন্য পেজে টার্মটি কতবার আছে, একাধিক টার্ম হলে শব্দগুলোর মাঝে দূরত্ব, পেজটি কতদিন ধরে ওয়েবে আছে ইত্যাদি অনেক কিছু বিচার করে পেজর‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে গুগল সার্চ টার্মগুলোর পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা বিচার করে। এর ভিত্তিতে গুগলের spelling-correction সিস্টেম কাজ করে। গুগলবট যেহেতু টেক্সটের সাথে পেজ কোডও ক্রলিং করে, তাই ইউজার চাইলে সার্চ টার্মটির অবস্থানও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন যে সেটি লিঙ্কে থাকবে, টাইটেলে থাকবে না লেখায় থাকবে। শুধু টার্মের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে রেজাল্ট না দেয়ার কারণেই গুগলের সার্চ রেজাল্টের মান এত উন্নত।

১৯৯৮ সালে গুগলে ব্যবহার হওয়া যন্ত্রপাতি

* দুটি ডুয়াল পেন্টিয়াম টু প্রসেসর ৩০০ মেগাহার্টজ সার্ভার যাদের ছিল ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম।
* চারটি প্রসেসরযুক্ত ৫১২ মেগাবাইট র‍্যামের একটি এফ৫০ আইবিএম আরএস৬০০০ কমপিউটার।
* একটি ডুয়াল প্রসেসর সান আল্ট্রা২ ৫১২ মেগাবাইট র‍্যামযুক্ত কমপিউটার।
* কয়েকটি হার্ডডিস্ক, প্রতিটি ৪ থেকে ৯ গিগাবাইট। মোট ৩৫০ গিগাবাইট।

বর্তমানে গুগলের রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কয়েক লাখ সার্ভার। মোট ডাটার পরিমাণ প্রায় ৩০০ টেরাবাইট। ২০০৪ সাল থেকে গুগল ইন্টেলের পরিবর্তে এএমডি প্রসেসর ব্যবহার করছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য।

এতক্ষণ জানলাম কিভাবে গুগল সার্চ কাজ করে। এবার দেখে নেয়া যাক নতুন অথবা ভবিষ্যৎ গুগলের ধরন। গুগল সার্চ হবে এখন 'কথোপকথন'-এর মাধ্যমে।

গুগল সার্চ কথোপকথন : আপনি ইন্টারনেটে কোনো কিছু সার্চ করছেন অথচ আপনার মনে হচ্ছে আপনি কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন বা কোনো একটি ভয়েস আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। ভাবছেন কিভাবে সম্ভব? এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছে বিখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন গুগল।

গুগলের ঘোষণা মতে, এখন থেকে সার্চের জন্য একজন ইউজার যেকোনো প্রশ্ন ভয়েসের মাধ্যমে করতে পারবেন এবং উত্তর পাবেন ভয়েসের মাধ্যমে। এক কথায় সার্চটি সম্পূর্ণ হবে একটি আলাপচারিতার মাধ্যমে। গুগল ইতোমধ্যে নতুন এ ভয়েস সার্চ প্রক্রিয়ার সফল পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। গুগলের নতুন এ সার্চ পদ্ধতি শুধু কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য, তবে গুগল বলছে আমরা মোবাইল ইউজারদের এ সুবিধা দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে গুগলের ডেভেলপার কনফারেন্স 'গুগল আই/ও'তে এ ঘোষণা দেন সার্চ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জননা রাইট। রাইট ওই সময় একটি কনভারসেশনাল সার্চ উপস্থিত সবার মধ্যে করেন। তিনি ভয়েসের মাধ্যমে গুগলের কাছে সান্তা ক্রুজে কী করা হয় দেখতে চান। গুগল তখন ওই এলাকার জনপ্রিয় কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রদর্শন করে। রাইট ওই তালিকা থেকে একটি অপশন সিলেক্ট করে প্রশ্ন করেন– এই জায়গা থেকে সান্তা ক্রুজ কত দূরে'। সাথে সাথে গুগল অডিও ভয়েসের মাধ্যমে উত্তর দেয় এবং একই সাথে ব্রাউজারে প্রদর্শন করে সান ফ্রান্সিসকো থেকে সান্তা ক্রুজের দূরত্ব।

গুগলের এ 'কনভারসেশনাল সার্চ' খুব শিগগিরই ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। সার্চের নতুন এ সুবিধা শুধু গুগলের ব্রাউজার গুগল ক্রোমে ব্যবহার করা যাবে। তবে অবশ্যই ব্যবহারকারীর কমপিউটারে ব্যবহারযোগ্য একটি মাইক্রোফোন থাকতে হবে।

গুগলের মতে, নতুন এ সার্চ সুবিধা একজন ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য দেবে। এ সার্চ সুবিধায় আরও থাকছে পাবলিক ট্রানজিট, সঙ্গীত অ্যালবাম, বই, টিভি শো, রিমাইন্ডার ইত্যাদি। গুগল নতুন এ সার্চ পদ্ধতিকে জ্ঞান চিত্র (Knowledge Graph) বলে আখ্যায়িত করেছে। যার ফলে একজন ব্যবহারকারী প্রতিটি সার্চের বিপরীতে কয়েক বক্স তথ্য দেখতে পারবেন।

উইকিপিডার তথ্যমতে, প্রতিদিন গড়ে তিনশ' মিলিয়ন ইউজার এ সার্চ ইঞ্জিনে দুই বিলিয়ন সার্চের কাজ করে থাকেন। উল্লেখ্য, ফেসবুক এ বছরের ১ মার্চ থেকে গ্রাফ সার্চ নামে একটি অপশন চালু করে। ফেসবুকের এ গ্রাফ সার্চ অপশন গুগলের কর্তাব্যক্তিরা সহজে মেনে নিতে পারেননি। গুগলের সিইও ল্যারি পেজ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন– গুগল ফেসবুকের গ্রাফ সার্চ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। পেজ আরও বলেন, সত্যিই তারা (ফেসবুক) তাদের প্রোডাক্টের জন্য একটি খারাপ কাজ করছে। ফেসবুকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ১.১১ বিলিয়ন। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, গুগল তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেই নতুন এ সার্চ পদ্ধতি।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা কোনটি বেশি জনপ্রিয় হয়– ফেসবুকের গ্রাফ সার্চ নাকি গুগলের কনভারসেশনাল সার্চ কজ

ফিডব্যাক : faisalb01@gmail.com